সমরেশ বসু
জন্ম ১১ই ডিসেম্বর ১৯২৪
মৃত্যু - ১২ই মার্চ ১৯৮৮

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

ঘরের পাশে আরশিনগর, সেথায় পড়শি বসত করে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকায় সমরেশ বসুর জন্ম হয়। তাঁর আসল নাম ছিল সুরথ বসু। সমরেশ তাঁর লেখকজীবনের ছদ্মনাম। যদিও পরে ঐ নামটির আড়ালে তাঁর পিতৃদত্ত নাম চাপা পড়ে গেছে।

নৈহাটিতে তার দাদা মন্মথ বসু চাকরি করতেন। বয়ঃসন্ধির সূচনায় সমরেশকে ঢাকা থেকে তাঁর দাদার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এখানে তিনি লেখাপড়া করবেন বলে। সম্ভবতঃ অষ্টম শ্রেণীতে সমরেশ এখানকার স্কুলে ভরতি হলেন, এবং একেবারে প্রথম থেকেই সহপাঠী বন্ধু হিসাবে পেয়ে গেলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি পরে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সমলোচক হয়েছিলেন। তাঁদের এই বন্ধুত্ব আজীবন ছিল তো বটেই। বরং বলা ভালো সমরেশের মৃত্যুর পরেও তাঁর বন্ধুর চিত্তে বরাবর জাগরূক ছিল। সমরেশ বসুর বিশাল রচনাবলী যে খণ্ডে খণ্ডে সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাতে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অনেকখানি। শুধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, আরও অনেক বন্ধু ছিল তাঁর। পরবর্তী কালে জীবনের নানা দিকে নানা পেশায় তারা ছড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি। মানুষের ভালোবাসা পাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। সকলের সে ক্ষমতা থাকে না।

স্কুল পড়ুয়া ছেলেটির নানারকম গুণ ছিল। বন্ধুদের স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পারি সে বাঁশি বাজাতে জানে, কীর্তনীয়ার ঢঙে কীর্তন গান গাইতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, পাঠ্যবহির্ভূত গল্পের বই বিস্তর পড়েছে, আর অপরিসীম তার সাহস ও প্রাণশক্তি। এই সব বিদ্যা ও বৈশিষ্ট্য সঙ্গে নিয়েই সুরথ বা সমরেশ নৈহাটি এসেছিলেন। ফলে সহপাঠীদের চোখে তিনি হিরো। কেউ কেউ তাঁর মধ্যে শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের ছায়াও দেখতে পেতেন।

এই ধরনের জীবন প্রচলিত পথ ধরে চলে না, তাঁরও চলল না। বিশ বছর বয়স হতে না হতে তিনি একটি মেয়ের প্রেমে পড়লেন; ব্রাহ্মনের ঘরের মেয়ে এবং তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। প্রত্যক্ষদর্শী লিখছেন ''মনে রাখা দরকার যে সময়টা ছিল প্রবোধ সান্যালের প্রিয় বান্ধবীর যুগ। সমরেশ যদি তাদের ভালোবাসাটাকে প্লেটোনিক স্তরে বেঁধে রাখতে পারত, তাহলে তার জীবন নিভৃত মধ্যবিত্ত ভরসার নিরাপদ খাতেই বয়ে যেত। কিন্তু সমরেশ কোনোদিন ভাবের ঘরে জুয়াচুরি করেনি - না জীবনে, না সাহিত্যে''। (জীবন ও শিল্পের যুগলবন্দি : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়)। সমরেশ তাই লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখে, গুরুজনদের অসন্তোষ শিরোধার্য করে, গৌরী নামের সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে পুরোদস্তুর সংসার পাতলেন।

গৌরী বসু অসাধারণ রমণী ছিলেন। উনিশ কুড়ি বছরের একটি উপার্জনহীন অপ্রতিষ্ঠ ছেলের হাত ধরে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করবার দুঃসাহস এবং শক্তি তাঁরও ছিল। সে পর্বে সমরেশ যে তলিয়ে যাননি বরং উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন, তাতে তাঁর অবদানও অনেকখানি। যাই হোক নৈহাটির অদূরে আতপুরে একটি বস্তিসদৃশ টালির ঘরে তাঁদের সংসার শুরু হল। সমরেশ কাজ পেলেন ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাকটারিতে। নকশা ঘরের সামান্য চাকরি। ইতিমধ্যে সন্তানেরাও আসতে শুরু করেছে। আর এই অন্নচিন্তা অর্থচিন্তায় জর্জর অবস্থাতেও, কর্মস্থলের নক্‌শা ঘরের নিভৃতে তাঁর মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে আর একটি সঙ্কল্প। লেখক হবার জন্য তিনি তৈরি হচ্ছেন। 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসের খসড়া রচিত হয়েছে, যদিও বাইরের লোকে এখনো তার খবর রাখে না।

লেখক হবার প্রণোদনা তিনি পেলেন কোথা থেকে? 'নিজেকে জানার জন্য' নামক এক রচনায় সমরেশ নিজেই সে ইতিহাস বলেছেন। শৈশবকালে ব্রতকথার শেষে তাঁর মা গল্প বলতেন। অসামান্য কথক ছিলেন তিনি। তাঁর গল্পকথনে তিনি কল্পলোকের আস্বাদ পেতেন। এই গল্পগুলিকে তিনি বলেছেন তাঁর লেখক হবার 'অবচেতন প্রেরণা'। চেতনা প্রেরণা এসেছিল বই থেকে। ''বাংলা তেরোশো একতিরিশে জন্মালে যাঁদের মুদ্রিত রচনাসম্ভার হাতের কাছে আসা উচিত ছিল এসেছিল সকলেই। তাঁদের অনেক নাম। সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদির মতো তাঁরা ছিলেন আমার আকাশ জুড়ে'' (নিজেকে জানার জন্য : সমরেশ বসু)। আসলে তাঁর নিজের মনের মধ্যেই ছিল সেই আগুন যার নাম প্রতিভা) নিজের আত্মপ্রকাশের পথ সে নিজেই খুঁজে নেয়। নইলে তাঁর তখনকার জীবনযাত্রায়, দৈনিক বেতন এক টাকা চার আনা, সঙ্গে ওভার টাইম, এই অবস্থায় অন্য যে কোনো লোক সাহিত্যকে মনে করত কল্পনাবিলাস।

তখনো তাঁর লেখা আছে অন্তরালে, কিন্তু প্রকাশ্যে আর একটি কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। তা হল রাজনীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরের ঐ সময়টিতে আমাদের দেশের অনেক তরুণই মনে করেছিলেন বিপ্লব বুঝি এসে গেল। সেকালের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে সমরেশ যোগ দিয়েছিলেন। উনিশশো তেতাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশের শেষ পর্যন্ত ইছাপুরের ফ্যাকটারিতে তিনি কাজ করেছিলেন। তখন সমানতালে পার্টির কাজও করেছেন। ট্রেড ইউনিয়নের সূত্রে যেমন শ্রমিকদের বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তেমনই তাদের যারা নেতা সেই সব উঁচুতলার মানুষদেরও খুব কাছাকাছি এসেছেন। নানা স্তরের মানুষ সম্বন্ধে তাঁর এখনকার অভিজ্ঞতা পরবর্তী সাহিত্যজীবনে সাহায্য করেছে বিপুল ভাবে। ভদ্র চাকরি করে মধ্যবিত্ত সীমানায় বাঁধা থাকলে ও সুযোগ তাঁর হত না।

১৯৪৩ সালে তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'আদাব' পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হল। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা মানবিকতার গল্প। ঐ একটি গল্পেই তিনি লোকের চোখে পড়লেন, কারণ গল্পটি ছিল দারুন প্রাসঙ্গিক। দেশ পত্রিকায় বেরোল গুনিন। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। গুনিনের জীবিকা নেওয়া এক গ্রাম্য যুবকের বিফল প্রেমের রোমান্টিক গল্প। এটিও প্রশংসিত হল।

সমরেশ যেখানে থাকতেন সেই নৈহাটি জগদ্দল এলাকার একটা নিজস্ব চরিত্র আছে। এটি শিল্পাঞ্চল। তখন চটশিল্পের রমরমার যুগে গঙ্গার পাড় ধরে সারি সারি চটকল ছিল। অন্য শিল্পও কম ছিল না। জনসাধারনের একটা বড় অংশ ছিল অবাঙালি শ্রমিক। শ্রমিক

সৃষ্টিসন্ধান

নয়, শুধু রোজগারের আশায় দূর বিহার উত্তরপ্রদেশের দেহাত থেকে চলে এসেছে এমন অনিকেত জনগনের সংখ্যা ছিল বিশাল। কত রকম বিচিত্র পেশায় তারা যে উদরান্নের জোগাড় করত দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। গ্রামবাংলার অধিকাংশ জায়গার মত এটি কৃষিপ্রধান জায়গা নয়। শান্তিপূর্ণও নয়। চুরি ডাকাতি রাহাজানি লেগেই থাকত। নৈহাটির বিশাল রেল ইয়ার্ড ছিল অপরাধীদের লীলাক্ষেত্র। অর্থনীতির নিয়মে এক শিল্প যেমন আর শিল্পকে ডেকে আনে, সমাজনীতির নিয়মেও সেইরকম এক অপরাধি অপর অপরাধিকে ডেকে আসে। অপরাধজগৎ আকর্ষণ করে অবৈধ আবগারি ও নারী নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য। উত্তর চব্বিশ পরগণার গঙ্গাতীরের এই বিচিত্র সমাজবিন্যাস যে সমরেশ তন্ন তন্ন করে দেখেছিলেন তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যে তার প্রমাণ আছে। চটকলশ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবাদে এমন কিছু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল যাঁদের কাছে এখানকার শিল্পইতিহাস নখদর্পনে রয়েছে। এঁদের কারও কারও কাছে তিনি গল্পের মত করে শুনেছিলেন কিভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে এদেশে চটকলের পত্তন হয়েছিল, কেমন ছিল সেকালের দোদণ্ডপ্রতাপ সাহেব মেমসাহেবরা, কী করে শুরু হল শ্রমিক আন্দোলন। এই সব শুনতে শুনতে তাঁর মনের মধ্যে মহাকালে যাত্রাপথটি পরিস্ফুট হয়ে উঠত। এইভাবেই তৈরি হল উত্তরঙ্গ উপন্যাসের খসড়া।

১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে আইনি ঘোষিত হওয়ায় আরও অনেকের সঙ্গে সমরেশ বসুও গ্রেপ্তার হলেন। জেলে বসেই শুরু হল তাঁর উত্তরঙ্গ উপন্যাস। জেলবাস তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। কারণ সংসার চালাবার জন্য যে উর্ধশ্বাস দৌড় তাঁর ছিল তাতে বাধ্যতামূলক ছেদ পড়ল একটা। এখন তিনি অবকাশ পেলেন নিজের মনের দিকে তাকাবার। ইতিমধ্যে পার্টির কোনও কোনও মহলে তিনি অবাঞ্ছিত হয়ে গিয়েছেন সেটা তাঁর জানা ছিল না। জানা ছিল না সেখানকার অন্তর্দ্বন্দ্বের নৃশংস চেহারা। এখন জানতে পারলেন একটু একটু করে। পঁচিশ বছরের আদর্শবাদী তরুণ মনে তার প্রতিক্রিয়া হল বিরাট। তাঁর মনে বন্ধু ও শত্রুদের পুনর্বিন্যাস হল। তিনি নিজেই লিখেছেন - ''বন্দী জীবনই আমার দৃষ্টিকে করেছিল স্বচ্ছ আর সুদূরপ্রসারী। মানবচরিত্র, যা ছিল আমার কাছে গভীর অন্ধকারে জেলের মধ্যেই সেই মানবচরিত্রের গায়ে কোথাও কোথাও টুকরো আলোকপাত হয়েছিল। সম্ভবত : দুঃখ এবং গ্লানির মধ্যেই নিজেকে এবং অপরকে কিছুটা চেনা যায়' (নিজেকে জানার জন্য ঃ সমরেশ বসু)

কয়েকমাস পরে জেল থেকে তিনি ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু পুরনো চাকরিটা আর ফিরে পেলেন না। যদি তিনি আর কখনও রাজনীতি করব না বলে মুচলেকা দিতেন তাহলে ফিরে পেতেন। কিন্তু তা করতে তাঁর সম্মানে বাধল। তিনি স্থির করলেন এবার থেকে লিখেই জীবিকার্জন করবেন। কিন্তু সে তো অনেকদিনের ব্যাপার। আপাতত : দিন চলাই ভার। তিনি যতদিন জেলে ছিলেন ততদিন তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে বিধান রায় তাঁর পরিবারকে একটা মাসোহারা দিতেন। তাতে তাঁদের অনাহারে মরতে হয় নি। এখন স্বভাবতঃই সে মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেল। এই দুঃসময়ে অনেক অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে সাহায্য এসেছিল। আর একটা বড় সাহায্য করেছিলেন তাঁর জেলবাসের সঙ্গী সর্বভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সম্পাদক নিরঞ্জন সেন। তিনি তাঁর প্রকাশক ভাই শচীনন্দন সেনের কাছে সমরেশকে পাঠান বই ছাপাবার জন্য। তিনি তখনও পর্যন্ত অসমাপ্ত উত্তরঙ্গ ছাপাতে রাজি হলেন এবং শেষ করবার জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে কিছু টাকাও দিলেন। অবশেষে উত্তরঙ্গ যেদিন ছাপা হয়ে বই আকারে বেরোলো সেদিন তাঁর ঘরে আর অন্ন নেই। বই কেনবার জন্য সমরেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা নৈহাটি স্টেশন সংলগ্ন বাসন্তী কেবিনে অপেক্ষা করছেন। বই এলে তাঁরা কিনবেন। তাতে বন্ধুকে সাহায্য করা হবে। বৃষ্টি বাদলে এক হাঁটু জলকাদায়, গায়ের জামা দিয়ে ঢেকে বই নিয়ে সমরেশ সেখানে এলেন রাত্রিবেলা; এবং বই বিক্রির টাকায় চাল ডাল কিনে বাড়ি গেলেন আরও রাতে। সেটা ১৯৫১ সাল।

উত্তরঙ্গ পড়ে কবি বিষ্ণু দে চিঠি দিয়ে নবীন লেখককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই লেখক সম্ভাবনাময়, এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের বাতাবরণ থেকে মুক্ত। পরিচয় পত্রিকায় চিন্মোহন সেহানবিশ এ বইয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেন এবং অশ্লীলতার অপবাদও দিলেন। অন্য পক্ষে আর এক বামপন্থী পত্রিকা নতুন সাহিত্যে দু সংখ্যা ধরে ধরে সনৎ বসু, অচ্যুত গোস্বামী ও ও ঋষি দাশ সেহানবিশের বক্তব্য খণ্ডন করে সমরেশকেই সমর্থন করলেন। এইভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাস নিয়েই বাদানুবাদে সাহিত্যের আসর বেশ জমে উঠল। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে সমরেশ বসুর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে যে যে বিতর্ক চিরকাল উঠত তার সবগুলিরই গোড়াপত্তন হয়ে গেল এখান থেকেই। তর্কবিতর্কে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হোল যে এই নবীন লেখক ভালোই লিখুন বা মন্দই লিখুন, সন্দেহ নেই তিনি একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁকে উপেক্ষা করা যাবে না। তারপর ঘটল একটি সুন্দর ঘটনা যার স্নিগ্ধ প্রভাব লেখকের মনে চিরকাল জেগে ছিল। ঘটনাটি এই যে সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপ গুপ্ত একদিন তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে সমরেশ বসুকে নিমন্ত্রণ করলেন। আহারান্তে উপহার দিলেন খুব দামি একটি কলম, এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংপাদপত্রে সেকালের কথা নামক দু খণ্ডের বইখানি। তখনও পর্যন্ত সমরেশের কোনও ফাউন্টেনপেন ছিল না, এটিই প্রথম।

উত্তরঙ্গের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশক বদল হল। লেখক ভালো টাকাপয়সাও পেলেন। পরের দু বছরের মধ্যে বেরোল বি.টি.রোডের ধারে, নয়নপুরের মাটি, শ্রীমতী কাফে ও বেশ কিছু ছোটগল্প। খুব স্বচ্ছল না হলেও মসৃণ হল সংসারযাত্রা। লেখক হিসাবে সমরেশ বসু প্রতিষ্ঠা পেলেন।

যে কোনও শিল্পির জীবনে এই প্রস্তুতিপর্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই বোঝা যায় তাঁর সঙ্কল্পের জোর কতটা, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কতটা যুদ্ধ তিনি করতে পারেন। সমরেশের জীবনের প্রস্তুতিপর্ব রূপকথার মত রোমাঞ্চকর। কিছুদিন আগে দেশ পত্রিকায় তাঁর ছোট ছেলে নবকুমার বসু চিরসখা নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলেন। ঐ উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেখানে তিনি শুধু চরিত্রপাত্রদের আসল নামগুলি বদলে দিয়ে তাঁর পিতামাতার জীবনসংগ্রামের সত্য ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। পাঠক হিসাবে আমাদের একটিই অতৃপ্তি এই থেকে যায় যে সংগ্রামটি লেখক মূলত: তাঁর মায়ের দৃষ্টিকোন থেকে দেখেছেন বলে তাঁর অন্তরের ইতিহাসটি যত সুস্পষ্ট হয়েছে তাঁর পিতার সেভাবে হয় নি। যে প্রবল প্রাণশক্তির বলে একটা লেখাপড়া শেষ না করা কর্পদকশূন্য ছেলে সংসার পাতবার সাহস পায়, প্রমাণ করতে পারে যে তার এই সিদ্ধান্ত ক্ষণিকের খেয়াল ছিল না, অবিশ্বাস্য হীনাবস্থা থেকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছায়, এবং পৌঁছাবার পরেও আমৃত্যু থেকে যার অতৃপ্ত, অনুসন্ধানী ও নিয়ত পরিবর্তনশীল তার চরিত্রের

সৃষ্টিসন্ধান

ধারনদন্ডটি কি ছিল এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। তার উত্তর তাঁর পুত্র দিতে পারেন নি। কিন্তু বন্ধুরা দিয়েছেন। গৌরকিশোর ঘোষ, সোমনাথ ভট্টাচার্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ বসু, দিব্যেন্দু পালিত প্রভৃতিদের তাঁর সম্বন্ধে মূল্যবান বিশ্লেষণ আছে। তাঁদেরই একজনের কথা এইরকম—

''আমি এক সময়ে তার সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে সাহস শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম। আজ তার গোটা জীবন ও সাহিত্য সংগ্রাম চোখের ওপর দেখতে দেখতে আমি সাহস শব্দটি পালটে দিতে চাই। সাহস তার অবশ্যই ছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ছিল, (কিন্তু) এটা শুধু সাহস নয়, এটা তার যন্ত্রণা বহন করবার শক্তি। যে যন্ত্রণা তাকে চিরদিন ঘরছাড়া করে তুলেছে, যে যন্ত্রণা তাকে জীবনের কোনো স্তরেই শান্ত রাখতে পারেনি, তার সমস্ত শক্তি হল সেই যন্ত্রনাকে ফিরে ফিরে আমন্ত্রণ করবার শক্তি।'' (জীবন ও শিল্পের যুগলবন্দি - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়)

এই অতৃপ্তি থেকেই তাঁর কালকুট সত্তার জন্ম। যখন তাঁর অন্নচিন্তা চমৎকার সবে কমছে, পায়ের নীচে সবেমাত্র মাটি পাচ্ছেন তখন থেকেই কালকূট বাসা বেঁধেছে তাঁর মনে। সাধু সন্ন্যাসী না হয়েও সংসারবিরাগী ভ্রাম্যমান একজন মানুষ ধূলিধূসরিত পায়ে ভারতবর্ষের তীর্থে, মেলায়, পথেপ্রান্তরে খুঁজে বেড়ায় কোথায় পাবো তারে। সেই লোকটি কেতাদুরস্ত ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু নন, কালকূট।

কালকূট ছদ্মনামটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন অনেকদিন আগে। জেলে থাকতে থাকতে তিনি প্রেত নামে একটি রাজনৈতিক নাটক লেখেন। তাতে সরকারি ব্যবস্থার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ছিল বলে প্রথম প্রকাশ কালে ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করেছিলেন। ঐ নাটকের বিষয়বস্তু বিচারে লেখকের কালকূট নামটি ছিল খুবই যুক্তিযুক্ত। অমৃত কুম্ভের সন্ধানে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরোবার সময় তিনি ঐ নামটিই ব্যবহার করলেন। পুরানে আছে গরুড় স্বর্গ থেকে অমৃতকুম্ভ নিয়ে এসে কুশঘাসের ওপর রেখেছিল। কদ্রুপুত্র নাগজাতি পরে এসে দেখল কুম্ব আর নেই। যদি ঘাসে ছিটেফোঁটা অমৃত পরে থাকে এই আশায় তারা জিভ দিয়ে কুশঘাস চেটেছিল। তদবধি সাপের জিভ চেরা, সমরেশ এইরকম একটা ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছেন যে তিনিও যেন ঐ নাগদের মত অমৃত সন্ধান করে করে ব্যর্থ হয়েছেন। নিজের বিষে তিনি নিজেই জর্জরিত। তাই তাঁর নাম কালকূট।

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে বইটি কিন্তু কুম্ভমেলার মহাক্ষেত্রে অমৃত সন্ধানেরই গল্প। এই বইয়ের উৎপত্তির ইতিহাসটি চমকপ্রদ।

১৯৫৩র শেষ, সমরেশ বসুর তখন মাত্রই তিনচারখানা বই বেরিয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা বন্ধ। পার্টি তাঁকে ছাড়ুক, বা তিনিই পার্টিকে ছাড়ুন আপাতত: দলতন্ত্রকে তাঁর মনে হচ্ছে বন্ধ জলা। সেই শূন্য স্থানে দেখা দিচ্ছে অন্য একটি আকাঙ্খা - দেশকে জানবার দেশের মানুষকে জানবার। ১৯৫৪ র সূচনায় প্রয়াগে যে কুম্ভমেলা হবে তিনি সেখানে যেতে চান। কিন্তু পাথের কই? নানা দরজায় ঘুরে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের শরনাপন্ন হন। সাগরময় ঘোষ ও আনন্দবাজারের কর্মাধ্যক্ষ কানাইলাল সরকার পরমার্শ করে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন। শর্ত হয় এলাহাবাদে তাঁর বসবাস ও মেলা দেখার বন্দোবস্ত তাঁরা করে দেবেন। সেখান থেকে প্রতিদিন মেলার একটি প্রতিবেদন তিনি আনন্দবাজারে পাঠাবেন। প্রতিবেদন পিছু দক্ষিণা পাবেন কুড়ি টাকা করে। তারপর ফিরে এসে বড় করে যদি কিছু লিখতে চান তার কথা আলাদা। সমরেশ প্রয়াগে চলে গেলেন, দুচোখ ভরে দেখলেন মহামানবের মিলনলীলা। সেইবারই ঘটেছিল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ব্যবস্থার ভুলে পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। সে মহাশ্মশানের চিতানলও তিনি দেখলেন। তারপর ফিরে এসে দেশ পত্রিকায় কালকূট ছদ্মনামে শুরু করলেন ধারাবাহিক অমৃতকুম্ভের সন্ধানে। তার পর থেকে তাঁর যাবতীয় ভ্রমণকাহিনি কালকূট নামেই প্রকাশিত হয়েছে।

স্বপ্ন নয়, শান্তিনয়, কোনো এক বোধ কাজ করে

সমরেশ বসুর প্রথম দিককার লেখাগুলি মোটামুটি জনপ্রিয় হয়েছিল, বিশেষত: অমৃত কুম্ভের সন্ধানে তো খুবই। ঘোর দারিদ্র্য দূর হয়ে তাঁর জীবনে ক্রমে সচ্ছলতা এল। নৈহাটি স্টেশনের কাছে একটি ছোটখাট গরিবি বাড়ি হল। তারপর সে বাড়ি বেশ বড় হল। তাতে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকল। এ সব একদিনে হয় নি, বা তাঁর নিজের কৃতিত্বেও হয় নি। হয়েছিল তাঁর সুগৃহিনী পত্নীর কৃতিত্বে। সেই লক্ষ্মীস্বরূপা নারী খুঁদকুড়োটিও অপচয় না করে নিপুণ ব্যবস্থাপনায় একটু একটু করে সংসার গুছিয়ে তুলছিলেন। এই অবস্থায় যে কোনো মানুষ রণক্লান্ত সৈনিকের মত বয়ে বসে নিজের সাফল্যসুখটুকু ভোগ করতে চায়। কিন্তু গৃহীর পক্ষে যা কাম্য, শিল্পির পক্ষে সেটাই মারাত্মক। যে শিল্পি সুখে মজে, যন্ত্রনাকে ডেকে আনে না, যন্ত্রনা বহনও করে না, তার আত্মা আস্তে আস্তে মরে যায়। পাঠকের সৌভাগ্য যে সমরেশের প্রকৃতি অন্যরকম ছিল। হয়ত বা নিয়তিও।

সাংসারিক সুদিনের সূচনাতেই, যখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ তেত্রিশ, তখনই দেখি একধরনের বিপন্নতার বোধ তাঁর মনে উৎপন্ন হয়েছে। তখন তিনি গঙ্গা নামক বিখ্যাত উপন্যাসটি লিখছেন। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে গঙ্গার বুকে ঘুরে বেড়ায় মৎস্যজীবীরা। যাদের তিনি নাম দিয়েছেন 'মাছমারা'। মাছেরা (জেলেদের ভাষায় মীনেরা) সাগর থেকে মিষ্টি জলে ঢোকে ডিম পেড়ে বংশবিস্তার করতে। তখন মাছমারারা তাদের ধরে। বিধাতার বিধান বড় অদ্ভুত। যে কাজে মীনেদের জীবনধারা রক্ষা হবে তাতেই আবার তাদের মৃত্যুও হবে। আর মাছমারাদের জীবনও কি তাদের শিকারের মতই নিষ্ঠুর অসহায় মৃত্যুতাড়িত নয়? এই বিশাল নদীর বাঁকে বাঁকে কোথায় কখন আসবে ঝাঁক ঝাঁক মীন তাদের জালে ধরা দিতে তা কি তারা জানে। কিন্তু ক্ষুধা নিয়মিতই আসে। ঘোর অনিশ্চয়তায় ভরা তাদের জীবনযাপনে অভুক্ত অসুস্থ নিরন্তর শিকারি কেউ বা জলের বুকেই মরে যায়, কেউ বা প্রিয়তমা পরিপূর্ণা নারীকে অনিশ্চিত অপেক্ষায় ফেলে রেখে চলে যায় অজানা সাগরে। এভাবেই বয়ে যায় প্রবাহিনী গঙ্গা।

সাহিত্যজীবনের মধ্যপর্বে এসে সমরেশের জীবন ও সাহিত্য দুইই একটা আলোড়নের মধ্যে পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এমন কিছু কিছু কথা চলে আসে যা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কিন্তু তাঁকে বোঝবার জন্য সত্য ঘটনার মুখোমুখি হওয়া দরকার। তাঁর জীবনে দ্বিতীয় নারীর আগমন ঘটল। সে তাঁরই পত্নীর ছোট বোন, বয়সে তাঁদের চেয়ে অনেকটাই ছোট। একজন লেখক

বা শিল্পীর জীবনে একাধিক নারীর আবির্ভাব জগৎসংসারে নতুন কিছু নয়। সে সব সম্পর্ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংসারের বাইরে থেকে যায়। শিল্পির সামাজিক জীবনে কোন ঝড় তোলে না। এক্ষেত্রে তা হল না। সমরেশ মেয়েটিকে বিয়ে করে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিলেন এবং তাকে নিয়ে সংসার পাতলেন। এই ঘটনা তাঁর পক্ষে কলঙ্কজনক এবং তাঁর স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে তাঁর সন্তানদের লোকসমাজে মাথা হেঁট হবে। এবং সর্বোপরি যাঁরা তাঁকে পছন্দ করেন না তাঁদের হাতে তাঁর ক্ষতি করবার বাড়তি অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। এ সবই হয়েছিল। তবু সমরেশ জেনে বুঝে এ কাজ করলেন কেন? আজ তাঁর মৃত্যুর একুশ বছর পরে, সংশ্লিষ্ট কুশীলবরা যখন অনেকেই আর বেঁচে নেই তখন এ প্রশ্নের মুখোমুখি বোধহয় আমরা হতে পারি। প্রথম ব্যাখ্যা আছে তাঁর আত্মিক সততায়। জগতে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ আছে যারা অন্তরে একজনকে ভালোবেসে অপরের সঙ্গে যথাযথ সংসার ধর্ম করছে। তিনি যদি সেই দলের লোকই হতেন তবে তিনি সমরেশ বসু হতেন না। দ্বিতীয় কারণটি শুধু অনুমান করা যায় কোনো প্রমাণ নেই। তিনি কি নতুনতর যন্ত্রনাকে আহবান করতে চাইছিলেন নিজের জীবনে? সুনাম, সম্মান, সচ্ছলতা, প্রতিষ্ঠা কি শেকলের মত তাঁর অস্তিত্বকে বেঁধে ফেলছিল। গভীর বিতৃষ্ণায় তিনি ছিঁড়ে ফেললেন সেই সব নাগপাশ। তাঁর এই সময়কালে লেখা বইগুলির মধ্যে একটা দুর্দান্ত ক্রোধ টগবগ করে ফুটছে। বিবর, পাতক, প্রজাপতি, স্বীকারোক্তি, স্বীকারোক্তি নামের ছোটগল্প প্রভৃতি রচনা তার প্রমাণ। বিবর ও প্রজাপতি নিয়ে এককালে অনেক হৈ চৈ হয়েছিল। প্রজাপতি লিখে তাঁকে অশ্লীলতার দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেও হয়েছিল। সেদিন তাঁকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমর্থন করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ এবং আরো কেউ কেউ। ওদিকে খুব সুকৌশলে এই অপবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তিনি সি আই এর চর। আজকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে বলা ভালো যে প্রজাপতির মূল গল্পটিতে কোনো অশ্লীলতা ছিল না। অশ্লীলতা যদি কিছু থেকে থাকে তা নায়ক সুখেনের স্ল্যাং বুলিতে। সমরেশ বসু একটিমাত্র খোলা চিঠিতে দেশ পত্রিকায় নিজের বক্তব্য জানিয়েছিলেন। তিনি এই মর্মে কথা বলেছিলেন যে যদি কোন ছেলে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ক্রমাগত দেখে তার চারপাশের গুরুজনেরা সবাই তাকে যেরকম হবার জন্য উপদেশ দেয়, নিজেরা আদৌ সেরকম হতে চায়না। যদি সে দেখে বাল্যে তার বাড়ির বড়রা, কৈশোরে তার পাড়ার দাদা ও ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা, যৌবনে তার এলাকার নেতারা সকলেই মনে এক, মুখে অন্য, এবং সকলেরই ধান্দা লোক ঠকানো, তাহলে সেই ক্রুদ্ধ উদভ্রান্ত ছেলের মুখে ভদ্রভাষা আসবে কি? তার মুখে ঐ অবস্থায় যে ভাষা আসে তিনি সেটাই দিয়েছেন। 'বিবর' উপ্যাসের সঙ্গে আলবেয়ার কামুর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস The Outsider এর মিল আছে। আসলে বিবর এর নায়ক যে বিচ্ছিন্নতাবোধে (Alienation) আক্রান্ত তা আধুনিক সভ্যতার ব্যাধি। তখনকার নবীন লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বিবর পড়ে অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন, তাঁর নিজের ঘুনপোকা উপন্যাসও একই ধারার রচনা। বিবর ও প্রজাপতি নিয়ে যত হৈ চৈ হয়েছিল স্বীকারোক্তি নিয়ে তা হয় নি, কিন্তু এই পর্বের সমরেশকে জানতে হলে স্বীকারোক্তিই সবচেয়ে উপযুক্ত বই। লেখক নিজেও সেটাই মনে করতেন। কারণ ঐ দুই রচনায় (গল্প ও উপন্যাস স্বীকারোক্তি) আছে তাঁর আত্মানুসন্ধানের ''নৈতিক ও মানসিক আর্তি''। এই বিষয়ে তাঁর উক্তিটিই উদ্ধৃত করা যাক, ঈষৎ দীর্ঘ হলেও—

''গল্প স্বীকারোক্তি প্রথম নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিল, এক কমিউনিস্ট বন্দি তার নিজের কাছে, সম্মুখে যার উদ্যত দণ্ড স্পেশাল ব্রাঞ্চের বাঘা ইনভেস্টিগেটর। সে ঘোষণা করেছিল সত্যের স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনো সম্ভব হয় নি- বাল্যে পিতামাতার কাছে, যৌবনে স্ত্রী বা প্রেমিকার কাছে, কর্মে পার্টির কাছে এবং পুলিশের কাছে। দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয় বিবর এর ঠিক এক বছর পরে, যার কণ্ঠস্বরে ছিল না দৃষ্টি আকর্ষণকারী তীক্ষ্ণ ঝলক, কারণ উত্তম পুরুষে লিখিত, উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রের সকল স্বীকারোক্তিই ছিল এক যন্ত্রনাকাতর নৈঃশব্দে ভরা। সে আবিষ্কার করেছে তার দুই হাত কত শক্ত। যে হত্যা করেছে তার স্ত্রীকে, তার অফিসের বস কে, নিজের পলিটিক্যাল পাটির নেতাকে, গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে সুখে বেহিসাবি গাড়ির চালককে, পথের বাধা অক্ষম পথচারীকে; এবং তার শেষ লক্ষ্য ছিল হৃদয়ের একমাত্র আশ্রয় প্রেমিকের প্রতি, যা সে পারেনি। জীবনের যা কিছু সে অতি প্রার্থিত রূপে পেয়েছিল তার সব কিছুই সে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, কারণ বিশ্বাস ও জাগতিক জীবনের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো হত্যাই সে করেনি''। (নিজেকে জানার জন্য : সমরেশ বসু)

সারা জীবন ধরে সমরেশ বসু অজস্র লিখেছেন। লেখা ছাড়া তাঁর অন্য জীবিকা ছিল না বলে, এবং দুটি সংসার চালাতে হত বলে তাঁকে অজস্র লিখতে হয়েছে। ফলে তাঁর অনেক লেখাই তুলনামূলকভাবে ম্লান। কিন্তু যেগুলি তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা সেখানে তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার ধারাবাহিকতাটি লক্ষ্য করা যায়। ষাটের দশকে তাঁর জীবন একটা আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। অন্তর্লোকের অন্ধকার গলিখুঁজির মধ্যে তিনি সন্ধান করেছিলেন মানুষ ঠিক কি? অনেকদিন আগে একবার বন্ধুবান্ধবসহ শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়ে তাঁরা অন্নদাশঙ্করের বাড়ি উঠেছিলেন। লীলা রায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ''তুমি লেখ কেন?'' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ''মানুষকে জানবার জন্য লিখি।'' লীলা রায় প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন ''নিজেকে জানার জন্য নয় কেন?'' এই প্রশ্ন সেদিন তরুণ লেখকের মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করেছিল। পরে তা শাখাপল্লব বিস্তার করে বড় হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ দেখি তাঁর মধ্যজীবনে।

Strongest is the man who stands alone.

ষাটের দশক পার হয়ে এল সত্তরের দশক, দেশে উঠল অন্যরকম ঝড়। সেই সময়টায় রাস্তার ধারে দেয়ালগুলিতে প্রায়ই বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকত সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন। পথচারীরা সেদিকে দৃকপাত না করে চলে যেত। ঘরে উঠতি বয়সের ছেলে থাকলে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতো লোকে। আজ জঙ্গলমহলে যে খুনজখম হচ্ছে, তা আরও নৃশংসভাবে, কারনহীনভাবে কলকাতা শহরের বুকেই ঘটে চলত। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কার্যত: কোনো স্থায়ী সরকার ছিল না। বার বার মন্ত্রিসভা বদলেছে, বার বার মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে, বার বার হয়েছে বিদান সভা নির্বাচন। অরাজকতার সুযোগে চালাক লোকেরা যে যেভাবে পারে আখের গুছিয়েছে। তারপর ১৯৭২ এ এল সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমল, কঠোর দমননীতিতে সব রকম আন্দোলন ঠান্ডা করা হল। সেই দমননীতি লোকে ভালো চোখে দেখে নি। তারপর ১৯৭৭ সালে জনতার অনেক আশার পাখায় ভর করে এল বামফ্রন্ট। সমরেশ বসু প্রখর জাগ্রত চেতনা নিয়ে চোখ মেলে সব দেখলেন। এই সময়ে তিনি ঘুরেছিলেনও অনেক। বাংলার গ্রামে পথে প্রান্তরে মেলায়

সন্ধান করেছিলেন চিত্তের বিশল্যকরনী। কালকূটের অনেক বই আছে এ সময়কার। তারপর যে সিরিয়াস উপন্যাসগুলি লিখলেন তাতে দেখা গেল আবার তিনি চোখ রেখেছেন বাইরের জগতের ঘটনাপ্রবাহের দিকে। পরিবর্তমান সমাজ ও রাজনীতি আবার তাঁর রচনার বিষয় হয়েছে। নৈহাটির গঙ্গাতীর, বন্ধ কলকারখানা, অপরাধী অধ্যুষিত রেলইয়ার্ড, বেকার ছেলেদের আড্ডাঘর থেকে আবার উঠে আসছে তাঁর চরিত্ররা। মানুষ শক্তির উৎস, মহাকালের রথের ঘোড়া, টানাপোড়েন, যুগ যুগ জিয়ে, শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে, তিন পুরুষ, দশ দিন পরে, প্রভৃতি এই পর্বের রচনা। এর মধ্যে শাম্ব ছিল ব্যতিক্রমী লেখা, এবং শাম্বের জন্য তিনি একাদেমি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তবে সত্য কথা এই যে অবিতর্কিত পৌরাণিক উপন্যাস বলেই বোধহয় শাম্বের কাপালে এই পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটেছিল। নইলে শাম্ব এমন কিছু ভালো বই নয়।

আশির দশকে পৌঁছে বোঝা গেল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে স্থিতি এসেছে, কিন্তু বদলে যাচ্ছে তার চরিত্র। সমাজের সর্বস্তরে কায়েম হয়ে বসা পার্টিতন্ত্রের ফলাফল আজ লোকের চোখে পড়ছে, এবং কোন কোন সাহসী লোক তার বিরুদ্ধে মুখও খুলছে। কিন্তু সেদিন এ প্রক্রিয়ার সবে শুরু। সমরেশ নিজে রাজনীতি করা লোক বলেই হয়ত রোগলক্ষণ দেখা মাত্র চিনতে পেরেছিলেন। সেজন্য তাঁর বেদনা ছিল, রাগও ছিল। মতবিশ্বাসে তিনি তখনও বামপন্থী বলেই হয়ত বামপন্থার বিকার তাঁর মনে লাগত এবং সে কথা তিনি গোপনও করেন নি। দুটি উপন্যাসের কথা আলাদা করে উল্লেখ করি — তিন পুরুষ, এবং শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে। তিন পুরুষ ছোট বই। একটি রাজনীতি করা পরিবারের কাহিনি। প্রথম পুরুষ ছিলেন পরাধীন ভারতের গান্ধীবাদি স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর ছেলে যখন মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকল তিনি মনে মনে দুঃখ পেলেও তাকে সমর্থন করলেন কারণ নিজের মতে চলবার অধিকার সকলেরই আছে। এই দ্বিতীয় পুরুষের যৌবনকালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, এবং, সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট কার্যকালাপে জড়িত হবার আনুষঙ্গিক শাস্তি ও ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে তাকে যেতেও হল। এই নিগ্রহ তাকে করে তুলল অবিসংবাদী নেতা। তার নিজের ছেলে বাবাকেই তার গুরু বলে গণ্য করল এবং তারই রাজনীতিতে যুক্ত হল। এরপর মার্কসবাদিদের অবস্থা বদলেছে, তাদের হাতে এসেছে প্রদেশের শাসনক্ষমতা। ছেলেটির বাবা এখন প্রভাবশালী মন্ত্রী। এই পর্যায়ে এসে যুবক ছেলেটির মনে ঘনিয়ে উঠতে লাগল অন্যতর সংশয়। সমাজের সর্বত্র অসাধুতার বিস্তার এবং তার পেছনে দুষ্ট রাজনীতির মদত তার সহ্য হল না। সে প্রতিবাদ করল, এবং প্রতিবাদ করে দেখল যে সব স্বার্থকেন্দ্রে সে আঘাত করছে তার মধ্যে তার নিজের বাবাও আছে। খুব নিষ্ঠুর ও নিগূঢ় কৌশলে তাকে এরপর অকেজো করে দেওয়া হল। তার চাকরি গেল, তার প্রেমিকা বিমুখ হল, ঠাকুরদাদার দেওয়া আইনি অধিকার সত্বেও পৈতৃক বাড়ি ছাড়তে হল তাকে। এখন সে গঙ্গাতীরে একটা ফাটল ধরা পুরনো বাড়িতে আর এক বাতিল হয়ে যাওয়া মানুষের সঙ্গে থাকে। একা থাকে, যৎসামান্য আয়ে কোনমতে বেঁচে থাকে। এবং অপেক্ষা করে থাকে কবে সে দলের বাইরে একক মানুষ হিসেবে নিজস্ব ভূমিকাটিকে জানতে পারবে। ব্যক্তি ও রাজনীতির এই দ্বন্দ অন্যভাবে এসেছে 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসটিতে। এই প্রসঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের প্রসঙ্গটি স্মরণ করা যেতে পারে। দুজনের জীবনের সূচনাপর্বই একরকম ছিল। গৌরকিশোরও তাঁর প্রথম যৌবনে ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, উদরান্নের জন্য উঞ্ছবৃত্তি করেছেন, আসন্ন বিপ্লবে বিশ্বাস করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে চুটিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করেছেন, আবার একইসময় মোহমুক্ত হয়ে দল ছেড়েছেন। সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশও দুজনের মোটামুটি একই সময়ে।

এই গৌরকিশোর প্রথম যৌবনে সাগিনা মাহাতো নামক একটি গল্প লিখেছিলেন। এই গল্প সমরেশের খুব পছন্দের ছিল। পরিহাসছলে মাঝে মাঝেই তিনি বন্ধুকে বলতেন, যার হাত দিয়ে সাগিনা মাহাতো বেরিয়েছে, তার হাত আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় লিখে লিখেই অসাড় হয়ে যাক এটা তিনি চান না। কী ছিল সাগিনা মাহাতো গল্পে? গৌরকিশোরের নিজের কথাতেই দেখা যাক। — "গল্পটার মূল কথা ছিল পার্টি আর ব্যক্তির অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব। পার্টির মধ্যে যদি কারও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে তো পার্টি তাকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। সাগিনার ট্রাজেডি হল এই যে, সে শ্রমিককুলে জন্মগ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু ধীরে ধীরে তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে শুরু করল যখন থেকে, তখন থেকেই তার সঙ্গে পার্টির সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। সেই পার্টির নেতৃত্ব ছিল প্রধানত: মধ্যবিত্ত উচ্চবর্নের হিন্দু নেতাদের হাতের মুঠোয়। নেতারা যতই ঘোষণা করুন যে তাঁরা শ্রেণীখুইয়ে প্রলেতারিয়েত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের খাওয়া বসা বিয়ে সাদি আদব কায়দা কোথাও সর্বহারার কালচার নেই। মাঝে মাঝে মার্কসের কোটেশন উদ্ধৃত করে এবং সভায় মুষ্টি তুলে লাল সালাম জানিয়েই তাঁরা বুঝিয়ে দেন যে তাঁরা প্রোলেতারিয়েত। পঞ্চাশের প্রথম দিকেই সাগিনা মাহাতো গল্প আমি লিখি, কারণ ততদিনে এই ফাঁকিটা আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।" (প্রিয় বন্ধু সমরেশ বসু : গৌরকিশোর ঘোষ)

উদ্ধৃতিটি পুরোপুরিই দেওয়া হল, কারণ এর প্রায় ত্রিশ বছর পরের লেখা শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে'র নায়ক নওয়াল আগারিয়ার গল্পটাও একই রকম। বরং সাগিনায় যা ছিল বীজাকারে, এখানে বড় উপন্যাসে সেটা আরো পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। নওয়াল আগারিয়ায় পূর্বপুরুষ দূর পশ্চিম থেকে বাংলায় এসেছিল লোহা কাটার কাজ করতে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাহেব মালিকের অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল নওয়ালের সাহসী ঠাকুরদাদা। নওয়ালের রক্তে আছে তার উত্তরাধিকার। স্বাধীন ভারতে, শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে, নওয়াল হয়ে গেল শ্রমিকনেতা, তখন তার দিকে চোখ পড়ল ট্রেড ইউনিয়নগুলির। একটি দল তাকে জড়িয়ে ফেলল নিজেদের জালে। তার জনপ্রিয়তার হাওয়ায় সওয়ার হয়ে প্রসারিত করল নিজেদের ক্ষমতার সীমানা। ইউনিয়নের হাত ধরে এল পলিটিক্যাল পার্টি। নওয়ালকে তারা ভোটে দাঁড় করিয়ে পাঠিয়ে দিল দিল্লি। নওয়ালের রাজ্যপাটে বসল তাদের পছন্দের লোকজন। তারপর পার্লামেন্টের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গোলঘরে নওয়ালের মধ্যে যে মেটামরফসিস ঘটে গেল তা অজানা কিছু নয়। সবাই তাকে সত্যিকারের শ্রমিকের ঘরের শ্রমিক নেতা বলে পিঠ চাপড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু রাজনীতির এই উচ্চাপর্যায়ের খেলাঘরে সে যে বেমানান একথা গোপন থাকে না। সে জানেনা কোথায়, কার সঙ্গে, কিভাবে, কি কথা বলবে। সে না জানে পার্লামেন্টর কেতা, না জানে ভদ্র ভাষা, না আছে বক্তৃতাশক্তি, না রাখে ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতির খবর। এই আনপড় অমার্জিত গাঁইয়া লোকটি তার পার্টির শো পিস মাত্র। অথচ অগোচরে বদলে যাচ্ছে তার দৈনন্দিন অভ্যাস। আলোকপ্রাপ্ত সমাজের আরাম বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে আলগা হয়ে যাচ্ছে তার নিজের উত্থানভূমি থেকে। শ্রমিকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আলগা হয়ে গেছে। তারা তাকে আর আগের মত নিজেদের লোক মনে করে না। এমন কি তার বাপ ভাইও তার সঙ্গে থাকতে অস্বস্তি বোধ করে। নওয়ালের আর কোনো আইডেনটিটি নেই। এদিকে

পার্টির কাছেও নওয়ালের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তারা তাকে আবার টিকিট ও দিল না। কোনো কাজও দিল না। ছুঁড়ে ফেলে দিল ঔদাসীন্যে অবজ্ঞায়। এখন নওয়াল একা। তার হাতের শিকল ছিঁড়ে গেছে। রাজনীতির আঙিনায় ঘোরাফেরা করে সে এতদিনে শিখেছেও অনেক কিছু। এখন নিজের দেশে, কালে নিজের ভূমিকাটি তার খুঁজে নেবার পালা।

শেষের ফসল নিলেম তরী পরে, দিনান্তবেলায়

দেখি নাই ফিরে - সমরেশ বসুর শেষ লেখা।

শেষ হলে (বা না হলেও) হয়ত তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা। এই লেখার একটি ইতিহাস আছে, সত্তর দশকের শেষের দিকে একসময় সমরেশের তিন ছেলে মেয়ে শান্তিনিকেতনে থাকছিল। তিনি তখন প্রায়ই ওখানে যেতেন। তখনই তিনি প্রবাদপ্রতিম শিল্পি রামকিঙ্করের জীবনকাহিনি শোনেন। তাঁর সঙ্গে শিল্পির পরিচয়ও হয়। শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শিল্পির জীবন এক কঠিন সংগ্রামের জীবন। কত রকমের বাধা ও সত্য মিথ্যা দুর্নামের মধ্যে তাঁর উদাসীন বসবাস। এসব শুনে সমরেশ তাঁর সঙ্গে নিজের জীবনের কোথাও একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হল এঁকে নিকে একটা বড় বই লিখবেন। চেনাজানা মানুষদের নিয়ে এর আগে কত গল্পই তিনি লিখেছেন। কিন্তু এখন তাঁর মনে হল ওভাবে একটা গতানুগতিক কাল্পনিক কাহিনি লিখবেন না। একটা বড় কাজ করে যাবেন রামকিঙ্করকে নিয়ে। প্রথমে ভাবলেন শিল্পির মুখ থেকেই তাঁর জীবনকাহিনি শুনবেন। প্রথম দিকে বাধা দিয়েছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় নি। দুই অসমবয়সী শিল্পির মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল পরে, এবং রামকিঙ্করকে সঙ্গে করে তিনি তাঁর বাঁকুড়ার গ্রামেও গিয়েছিলেন। পরে নিজেও গিয়েছিলেন বার বার।

রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন উনিশ বছর বয়সে। তখন তিনি অনেক কাজই শিখে এসেছেন। তাই তাঁকে চিনতে হলে প্রাথমিক উনিশ বছরের জীবনটাও গভীরভাবে জানা উচিত এই বিবেচনায় সমরেশ তাঁর জন্মগ্রামে বার বার যেতেন। কত বিচিত্র জিজ্ঞাস্যই তাঁর ছিল। বাঁকুড়ার কথ্য ভাষা তিনি আয়ত্ত করলেন। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে সেখানকার খাওয়া দাওয়া, পালপার্বন আচার বিচার সংসারের সব কথা জানালেন। এমন কি কোন পথ দিয়ে রামকিঙ্কর পাঠশালে যেতেন তখন ওখানকার রেললাইন মিটারগেজ ছিল না ব্রডগেজ, গ্রাম্য রমনীদের ভাদু পরবের জন্য কি পুতুল রামকিঙ্কর গড়ে দিতেন সে সব খোঁজও নিতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ১৯৭৮ সালে এই পরিকল্পনা তাঁর মনে আসে। তারপর উপকরণসংগ্রহ চলতেই থাকে সমানে। ১৯৮১ সালে ভগ্নস্বাস্থ্য রামকিঙ্কর হঠাৎ মারা গেলেন। সাময়িক ধাক্কা খেলেও সমরেশ বসু কাজটা ছাড়েন নি।

অবশেষে উপকরণসংগ্রহ সমাপ্ত করে, অনেকখানি লিখে ফেলে তবেই তিনি বইখানি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপাতে দিতে পারলেন। তখন ১৯৮৬ সাল। বইয়ের নামকরণ সম্বন্ধে সমরেশ বসু যা বলেছিলেন তা এইরকম — রবীন্দ্রনাথ রামকিঙ্করকে ডেকে বললেন – শোন্, কাছে আয়। তুই তোর মূর্তি দিয়ে, ভাস্কর্য দিয়ে আমাদের সবখান ভরিয়ে দে। তোর মুর্তি যেমন রূপেই তোর কাছে ধরা দিক, তাদের তুই সর্বত্র এখানে ছড়িয়ে দে। আর শোন, যা ধরবি গোড়া থেকে শক্ত হাতে ধরবি, আর শেষ করবি। কিন্তু আর পিছন ফিরে তাকাবি না।" এই কথাগুলি সাগরময় ঘোষকে শুনিয়ে সমরেশ বলেন" রামকিঙ্কর গুরুদেবের এই উপদেশবাক্যটি উচ্চারণ করে বলেন— হাঁ, আমিও ফিরে দেখি নাই। - বলেই হো হো করেে আকাশফাটানো হাসি হেসে ওঠেন। – তাঁর ওই শেষ সার কথাটিই নেবো নামকরনে।"

কি দেখেছিলেন সমরেশ রামকিঙ্করের জীবনে? অন্ত্যজ সমাজ থেকে উঠে আসা একজন মানুষ, যার আধুনিক শিক্ষা নেই, নাগরিক মার্জনা নেই, কোনোরকম সহায় নেই, শুধু প্রতিভার জোরে ও সঙ্কল্পের জোরে আকাশ ছুঁতে পেরেছিল। ভদ্রজন তাঁকে কেবলি নিন্দা করে গেছে তিনি অন্ত্যজ সমাজ থেকে উঠে এসেও তাঁদের চেয়ে বড় হয়ে গেছেন বলে, আর তাঁর নিজের সমাজে তিনি ব্রাত্য হয়েছেন, ভদ্রলোক হয়ে গেছেন বলে। অপমানিত রামকিঙ্কর দারুন ক্রোধে একদা বলেছিলেন ''ভদ্দরলোকের মেয়ে বিয়ে করতে চাইলুম, সবাই চোখ রাঙালো। পরে ছোটলোকের মেয়ে বিয়ে করতে চাইলুম, সবাই বললে ছিঃ।" তিনি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন একটি ডোমের মেয়েকে ঘরে এনে, সামাজিক বিয়ে না করেও তার সঙ্গে সারাজীবন স্বামী স্ত্রীর মত বসবাস করে, এই অন্ত্যজকন্যা রাধারানীকে তাঁর সংবর্ধনামঞ্চে, সস্ত্রীক বসবার আসনে নিজের পাশে বসিয়ে, তবেই সংবর্ধনা নিয়ে।

দেশ পত্রিকায়, ধারাবাহিক বেরোবার সময় দেখি নাই ফিরে র সঙ্গে ছবি এঁকে দিতেন শিল্পি বিকাশ ভট্টাচার্য। এই কাজটিতে তিনি ক্রমেই নিবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলেন গভীরভাবে, এবং তিনজন শিল্পি মিলে এক অনবদ্য ঐকতান রচিত হচ্ছিল প্রতি সংখ্যায়। সেই সময় খানিকটা সজ্ঞানে খানিকটা অচেতনে রামকিঙ্করের মুখাবয়বের সঙ্গে তিনি সমরেশকেও মিলিয়ে ফেলছিলেন। এই প্রবণতা ক্রমশ: বাড়ছিল। এমন সময় মধ্যপথে চৌষট্টি পরিচ্ছেদ পার করে গল্পের রামকিঙ্কর যখন তাঁর পরিণত শক্তিকে অবস্থিত তখন হঠাৎ ধারাবাহিকে ছেদ পড়ল। আপন প্রিয় কর্ম অসমাপ্ত রেখে সমরেশ বসু বিদায় নিলেন ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দের ভরা বসন্তকালে।

সৃষ্টিসন্ধান